‘পিপীলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে’

প্রবাদবাক্যটির উৎপত্তি আমার জানা নেই। তবে অনেক বছর ধরে সমাজ-সংসারে আমি প্রবাদটি ব্যবহার হতে দেখি; আমার লেখায়ও মাঝে-মধ্যে প্রবাদটি ব্যবহার করি। প্রবাদটি মনে পড়াতে প্রাসঙ্গিক অনেক বিষয় ও বাস্তব ঘটনা মনের কোণে উঁকী দিচ্ছে। সবগুলো লিখতে না পারলেও কয়েকটা ঘটনা এখানে উল্লেখ সম্ভব। আমি ছোট ছোট বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই চলার পথে ব্যবহার করতে চাই। সবগুলোই আমাদের দেশ ও সমাজ নিয়ে। চারদিকের ঘটনা বলে দেয় আমাদের পরিণাম কোন দিকে যাচ্ছে। আমরা ধ্বংসের পথ বেছে নিচ্ছি, না উন্নতির পথে যাচ্ছি? এদেশের পরিণতি ধ্বংসোন্মুখ হওয়া মানে সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা নষ্ট হওয়া নয়; ওপর থেকে নীচে যারাই সমাজের যে স্তরে বা কাজে ক্ষমতাধর পরিচালক, তাদের বৃহদংশের চিন্তাধারা নষ্ট হওয়া। মানবজাতির উন্নতি বা ধ্বংস তার চিন্তাধারার উন্নতি-অবনতির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। দেশ ও সমাজ-পরিচালকদের চিন্তা-ভাবনার গন্ডি যত সঙ্কুচিত, বিকৃত ও নিম্নমানের হবে, দেশ তত অধঃপাতে ও রসাতলে যাবে, এটাই প্রকৃতির নিয়ম। মানুষের মগজে আগে বিকৃত কুটিল চিন্তা-ভাবনা গজায়, মনুষ্যত্বের বিচ্যুতি ঘটে; তারপর তা কাজে প্রকাশ পায় এবং কাজগুলো সামষ্টিক বা আত্ম-ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করে। আমরা মুখের জোরে, মিডিয়ার বদৌলতে কখনো ডাহা মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হই। সামাজিক মিডিয়ার তো কোনো নিয়ন্ত্রণ ও দায়দায়িত্ব নেই। যার মনে যা চায় তা-ই বলে ও লেখে। কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা সমাজ-সচেতন লোক তা বিচার-বিবেচনা করে বুঝতে পারে। কিন্তু সাধারণ ‘হুজুগে বাঙালি’র কি দশা হয়? ভূক্তভোগী সব মিথ্যার জবাবও দিতে পারে না, দেওয়াটা বাস্তবানুগও নয়। তা-ই উন্নয়নপ্রয়াসী লোকগুলোর ভালো কাজ, সমাজ-উন্নয়ন করার ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অনেককে পিছিয়ে আসতে হয়। বর্তমান পরিবেশ ভালো কাজের অনুকূল ভাবনা-চিন্তা ও কর্ম মেনে নেয় না। ভালো কাজ করতে গেলে কায়েমী স্বার্থবাদী লোকগুলোর স্বার্থে আঘাত লাগে। তারা খুব ধুরন্ধর। তাদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করা অতটা সহজ নয়। তাদের শিকড় সমাজের অনেক গভীরে প্রথিত। তাদের হারানো স্বার্থের কথা ভেবে ডাহা মিথ্যা প্রচার করে উন্নয়নপ্রয়াসী লোকদের পিছু লাগে, শেষে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। সমাজের রক্তচোষা লোক তাদেরকে সমর্থন করে। বাকিরা নির্বিকার হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। উন্নয়নপ্রয়াসীরা সম্মান বাঁচাতে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে বাধ্য হয়। এটাই বিদ্যমান পরিবেশ।

অনেক আগের একটা ঘটনা বলি। ঘরে ফেরার জন্য কয়েকমাস পর দূরগামী বাস থেকে কেবল নামলাম। দূর থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে আমার এক নাতি সামনে এসে একটা সালাম দিলো। বললো, ‘নানা, আমাদের স্কুল থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষায় আরো বারো জনসহ আমি ফেল করেছি।’ সন্ধ্যার পর ভাগ্নি ও জামাইকে নাতিসহ ডাকলাম। নাতিকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোদের স্কুল থেকে পাশ করেছে কতজন?’ বললো,‘তা প্রায় সত্তর-আশি জন হবে।’ বললাম, ‘ওদের নামগুলো তোর চোখে পড়লো না কেন? শুধু ফেল-করা ছাত্রদের নামগুলো তোর মুখস্ত হলো কি করে? সে যে একা ফেল করেনি এটাই সে যুক্তি দেখিয়ে আমাকে প্রথমেই বোঝাতে চাচ্ছিল, একটা আত্মতৃপ্তিও খুঁজছিল। কত ‘সুন্দর’ বুদ্ধি! আমাদের বোঝা দরকার, দেশ ও সমাজ-পরিচালকদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির পতন হয়েছে কী না? এরাই যত অধঃপতনের মূল।

দীর্ঘ বছর ধরে এদেশ দুর্নীতিতে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন, কখনো রানার্স-আপ হয়ে আসছে। উন্নতির কোনো চেষ্টা নেই। কোনো ভাবনাও নেই। যেহেতু পদে মধু আছে, ভাবনাটা পদ আঁকড়িয়ে থাকা বা পদে যাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোন বছর দুর্নীতিতে কয়টা দেশের উপরে অবস্থান সেটাই বড় মুখ করে প্রচারে ব্যস্ত। শত দেশের নাম তো ওপরে আছে। সেদিকে দৃষ্টি পড়ে না। ঠিক আমার নাতির দশা। একটা নামের ওপর-নীচ তো স্যাম্পলিং এরোরের কারণেও হতে পারে। আমরা সাধু হতে চাই না, সাধু সাজতে চাই। এটা আমাদের মজ্জাগত ব্যামো। ব্যামো বলছি এই কারণে যে, নির্বাচন যেমন-তেমন, অবৈধ টাকার পূর্ণমাত্রায় শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। পদ-পদবি, প্রার্থিতা বাজার দরে

কেনা-বেচা চলতে দেখলাম। বেড়ায় ক্ষেত খেলে ফসল টেকে কীভাবে? এদেশ তো সব সম্ভবের দেশ। প্রতিষ্ঠিত সত্য হচ্ছে: 'তুমি আমার কর্মকে সাপোর্ট করো না, মানে তুমি খারাপ লোক।' এটা আমাদের ভালো-মন্দ বিচারের অপ্রকাশিত মানদন্ড। সমাজের প্রতিটা পর্যায়ে গিয়ে একই মানদন্ড পাচ্ছি।

দ্বিতীয় ঘটনাটা এরকম, গত করোনার সময়ের কথা: আমার এক সহকর্মীর বলা গল্প। তার ভাগ্নে একসময় ভালো ছাত্র ছিল। এসএসসি পাশের পর বখে যায়। এইচএসসি-তে কোনোরকম পাশ করে। রাজধানীর যেনতেন এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ প্রোগ্রামে ভর্তি হয়। প্রায় বিষয়ে ফেল। কিছু কিছু বিষয়ে নামমাত্র পাশ। গড়ে ফেল। চার বছরের প্রোগ্রাম, পাঁচ বছর কেটে গেছে, পাশ আর হয় না। মহাবিপদ। দেশে করোনা এলো। দূরশিক্ষণের মাধ্যমে ফাঁকিবাজি লেখাপড়া ও পরীক্ষা শুরু হলো। এক পরিচিত ভালো ছাত্রকে টাকার বিনিময়ে নিয়ে এসে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করিয়ে জমা দেওয়া ও তাকে দিয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরীক্ষাগুলোর খাতা লিখিয়ে এক বছরে কয়েকটা বিষয়ে ভালো নম্বর অর্জিত হলো। সর্বোচ্চ সিজিপিএ ৪ এর মধ্যে প্রায় ফেল ২.১৫ সিজিপিএ পেয়ে পরীক্ষায় পাশ করেছে। ভাগ্নে আনন্দে মামার বাড়িতে মিষ্টির প্যাকেট হাতে হাজির। সে যে কী আনন্দ! শিক্ষার রাজ্যে ঠন-ঠনাঠন, দামি কাগজে বাহারি সার্টিফিকেট। টিকে থাকাটাই ফলাও করে বলা। আমার প্রশ্ন, ভাগ্নেরত্নের এসএসসি পাশের পর পাখা গজিয়েছিল কেন? ছয়টা বছর তো জীবন থেকে চলে গেল, তার অর্জন কতটুকু? বাকি জীবনটা কীভাবে কাটবে? 'লস অব অপরচ্যুনিটি' কত? আমাদের সুজলা-সুফলা সম্পদে ভরপুর দেশ, মরুময় কোনো দেশ নয়। এদেশের উন্নতি করা আদৌ কঠিন কিছু নয়। বেড়ার খেত খাওয়া বন্ধ করতে হবে। আমরা শুধু সামান্য অর্জনটুকু বিবেচনা করি, 'হারানো সুযোগ' কখনো বিবেচনায় আনি না। তাই পিছে পড়ে থাকি। যে সুযোগ হারিয়েছি, তারও হিসাব করা যায়। আমাদের দশা হচ্ছে, 'একটুখানি খ্যাতি হলে খ্যাতির ভারে ন্যুয়ে, চলার পথে পিছলে পড়ি, ঠেকাই মাথা ভূঁয়ে'।

আমার এটা বিশ্বাস যে, এদেশের 'মহান' রাজনীতিকরা দেশের জনগোষ্ঠীকে যেভাবে মোটাদাগে তিনভাগে বিভক্ত করে ফেলেছেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এমন বিভক্তি থাকলে দেশ কতদিনে স্বাধীন হতো তার প্রশ্ন থেকে যায়। দেশটা তো তখন ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সামষ্ঠিক স্বার্থ আদায়ে একজোট ছিল। সামষ্টিক স্বার্থ দেখার লোকের সংখ্যা যত কমবে, দেশ তত রসাতলে যাবে। সমাজটা তো এখন সামষ্টিক স্বার্থ বিবেচনার দিকে নাই, আছে ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারের ধান্দায়। রাজনীতিকদের এই ক্ষুদ্র স্বার্থ-চিন্তা জনপদের প্রতিটা স্তরে ছড়িয়ে গেছে এবং তারা সমাজের প্রতিটা কাজে তা চর্চা করে চলেছে। ব্যক্তি বেশি শক্তিধর হতে পারছে না বলে সমরঙা পাখাওয়ালা পাখিগুলো একসাথে জড়ো হয়ে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী গড়ে তুলছে। সংখ্যায় এরা কম হলেও সমাজে এদের দাপট, ক্ষমতাও বেশি, সমাজ এদের করতলগত। উদ্দেশ্য একটাই– স্বার্থোদ্ধার। কেউ মাথা তুলে এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলেই যত বিপত্তি। সামাজিক মিড়িয়ার মাধ্যমে মুখে মধু ঢেলে, ডাহা মিথ্যা অপপ্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। সামষ্টিক স্বার্থ বিবেচনার চর্চা না থাকলে, ধরো-মারো-খাও নীতি হলে, অবনতি ছাড়া উন্নতিই-বা হবে কীভাবে? সাধারণ মানুষের স্বার্থ ও ভালো-মন্দ দেখার লোক কোথায়? অথচ 'শিক্ষা-সেবা পরিষদ'-এর একজন কর্মী হিসেবে শিক্ষা ও সেবার উন্নতি নিয়ে এদেশের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করছি, তা এদেশের উন্নতির জন্য আদৌ সুখকর নয়। এই সত্যটা বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। সমাজসেবা করার লোকের বড্ড অভাব। মানব সেবার কীর্তন গাইতে গাইতে যারা এগিয়ে আসছেন, তাদের অধিকাংশেরই কথার সাথে ভেতরের উদ্দেশ্যের কোনো মিল নেই। পত্রিকা ছাড়া কষ্টের কথা বলবো কোথায়?

চলতি এসব বিষয় নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের প্রচুর গবেষণার রসদ রয়ে গেছে। সামাজিক গবেষণা ও তার প্রকাশও এদেশে অপ্রতুল। সমাজ ও মানুষের গতি কোন দিকে ও এর পরিণতি কি, তা গবেষণায় বের করে নিয়ে আসা

সম্ভব। আমি মাস্টারি করি ও দুচোখ দিয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে পর্যক্ষেণ করি বলেই লিখি। এ পথহারা দেশ ও সমাজকে গড়তে গেলে এসব বিষয় নিয়েই বেশি ভাবা দরকার, লেখা দরকার, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। অথচ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা নির্বাক। আমরা করণীয় দূরে ফেলে পরচর্চার যুদ্ধে নেমেছি। বাস্তবে আমরা উন্নতির ভাবনা এড়িয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হয়েছে বায়ান্ন বছর পেরিয়ে গেছে। আমাদের অর্জন কত? এতটা বছরে সরকারি প্রতিটা সেক্টরে 'রেট অব রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট' কত? ক্ষমতাধররা কতটা দুর্নীতিবাজ হয়েছে? 'সিস্টেম লস' কত? হিসাব কষে কে দেখছে! আমরা তো সবাই আত্ম-বিজ্ঞাপনের দিকে মনোযোগী। শুধু বিজ্ঞাপনে কি কাজ হয়? বিশ্বের এমন কোনো ব্রান্ডেড কোম্পানি কি কেউ দেখেছেন, কোয়ালিটির সাথে আপস করে ব্রান্ডেড কোম্পানি হতে পেরেছে? আমরা শুধু অতি ক্ষুদ্র অর্জনটুকুই (ভাগ্নে-তত্ত্বের মতো) ফলাও করে সামনে আনবো কেন? আমাদের এ পর্যন্ত 'লস অব অপরচ্যুনিটি' কত? আধুনিক এই টেকনোলজির যুগে আমরা কি এক্সট্রাপোলেশনের মাধ্যমে আগামকে (আমাদের পরিণতি কী) মোটামুটি জানতে পারি না? এ বিষয়ে যারা উন্নতির পথে দ্রুতবেগে ধেয়ে চলেছে, তাদের দেশের সাথে এদেশকে তুলনা করতে পারি। তা করি না। আমরা বিশ্বে অধঃপতিত, অতি অনুন্নত দেশের সাথে আপন দোষে তুলনীয় হচ্ছি, সে কাতারে পড়ে যাচ্ছি। আমাদের এহেন ভাগ্নেরত্বের দশা কেন? আমাদের পাশেও তো একটা দেশ আছে। তারা জীবনমানের অনেক দিক দিয়েই পিছিয়ে, জানি। তারা তো ঋণ করে ঘি খায় না! তারা তো আর্থিকভাবে দেউলে হবার পথে নেই? সেখানে তো প্রকাশ্যে রাজনীতি কেনা-বেচা হয় না? আমাদের এ ভগ্নদশা কেন? গলদটা কোথায়? তাদের জনগোষ্ঠীকে আইটি বিশেষজ্ঞ ও সুশিক্ষিত বানিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছেড়ে দিচ্ছে। অর্জিত জ্ঞান দিয়ে বিশ্বকে দখলে নিচ্ছে। আমরা তো রাজনৈতিক কূটচাল বিশেষজ্ঞ হচ্ছি। এদেশের জনগোষ্ঠীকে টেকনোলজি ও মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষায় শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ করে, মানবসম্পদ বানিয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে কি আমরা পারতাম না? আমাদের সে চিন্তা-ভাবনা করার লোক কোথায়? তাদের 'ভাগ্নে-কৌশলী রোগে' ধরেছে। প্রকৃত পারঙ্গম ও সুশিক্ষিত লোকের গৌরচন্দ্রিকা দেওয়ার ও তোষামোদি করার গুণ নেই। তাই তারা বর্তমান সমাজে উপেক্ষিত।

তৃতীয় ঘটনাটা হলো: 'ও মুর্শিদ পথ দেখাইয়া দাও' শিরোনামে গত ১৬/২/২৪ তারিখের লেখায় সমাজসেবা করার উদাহরণ দিতে গিয়ে ঢাকার অদূরে গাবতলীর পশ্চিম দিকে 'মধুর স্বাদে ভরা' একটা হাউজিং প্রকল্পের কথা লিখেছিলাম। সেখানেও আমার অভিজ্ঞতা উপরে আলোচিত অভিজ্ঞতার সাথে হুবহু মিলে যায়। সমাজটা পরীক্ষিত দুর্নীতিবাজ, মিথ্যাবাদী, কুটিল বুদ্ধিতে মাথাভরা, 'বর্ণচোরা মধুচোর', সাধারণ মানুষের অনেকেই ভাওতাবাজদের দখলে। মধুচোরেরা মহামানব সাজে, বিবেকের কোনো দংশন নেই, স্বার্থের জন্য যে কোনো প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে এমন ছদ্মবেশী সোস্যাল টাউটে প্রজেক্টটা ভরা। তাদের আবার গুরুও আছে। সাধারণ মানুষ এদের চিনতে ভুল করে। সেখানে আমার মতো মাস্টারসাহেবের মূল্য কোথায়? আমি না পারছি সাধারণ নিরীহ মানুষদের, যারা আমাকে অনুরোধ করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের ছেড়ে আসতে, না পারছি উপযুক্ত কন্ট্রোলিং সিস্টেম চালু করে তাদের মুক্তি পথ করে দিয়ে ফিরে আসতে। আমাদের সমাজসেবার চিন্তা শিকেয় উঠেছে। ভাবছি, প্রয়োজনে এ পত্রিকার মাধ্যমেই সরকারের সহযোগিতা চাইবো। এদেশের সাধারণ মানুষ তো অসহায়। লালনের সেই গানটা বার বার গাইতে চাই, 'আশা সিন্ধু তীরে বসে আছি সদায়, আশা...'।

(৫ মার্চ ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ